ক্রান্তিকালের সফল কাণ্ডারি

জন্মদিন | ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পরিবেশ বিষয়ে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ' লাভ করেছেন। চারটি ক্যাটাগরিতে এ সম্মান প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী পেয়েছেন নীতিগত ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানের জন্য। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিনিয়োগ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎকৃষ্ট। অন্য ক্যাটাগরিগুলো হচ্ছে বিজ্ঞান, ব্যবসায় ও সিভিল সোসাইটি। এবারে অন্যতম পুরস্কার বিজয়ী হচ্ছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মতো খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যখন পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়, তার তাৎপর্য হয় বহুমাত্রিক। এর প্রভাব অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন পড়ে, তেমনি বিশ্বসমাজেও নানাভাবে অনুভূত হয়। উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম ২০০৯ সালে ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন-নাপা এবং পরে ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজিক পেপার তৈরি করতে পেরেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০১১ সালেই বিশদ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এটাও মনে রাখতে হবে– কেবল অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বৈশ্বিক পর্যায়ে যে আলোচনা ও দরকষাকষি চলছে সেখানেও শেখ হাসিনা সবসময় বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করে চলেছেন। বাংলাদেশের সম্পদ অপ্রতুল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ সমস্যা মোকাবেলায় যে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এখন পর্যন্ত তা রক্ষায় যথেষ্ট পদক্ষেপ আমরা দেখছি না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এ খাতে নিজস্ব সম্পদ বরাদ্দ করে কাজ চালিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প। স্থাপন করেছেন ক্লাইমেট ম্যানেজমেন্ট ফান্ড। এটা হয়তো কাকতালীয়, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি নিউইয়র্কে ২৭ সেপ্টেম্বর যে সময়ে তাকে পরিবেশ বিষয়ে নোবেল পুরস্কারের সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ সম্মানে ভূষিত করেছে, তখন বাংলাদেশের দিনপঞ্জিতে ২৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে গেছে। আমরা জানি, এ দিনেই তিনি জীবনের ৬৮ বছর পূর্ণ করেছেন। বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জন্মদিনের যোগ্য পুরস্কার পেলেন তিনি। আর সেটা পেয়েছেন প্রিয় স্বদেশভূমিকে বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মের জন্য বসবাসের উপযোগী করতে এবং টিকিয়ে রাখতে। জলবায়ু-যুদ্ধে তিনি এখন বৃহত্তর পরিসরে নেতৃত্ব দেবেন– এটাই প্রত্যাশা।

শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে দেশের এক ক্রান্তিকালে আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন। আমরা দেখি, ওই বছর ১৭ মে দেশে ফেরার স্বল্প সময়ের মধ্যেই সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বের অবস্থানে চলে আসেন তিনি। এ সংগ্রামের অভিজ্ঞতাপুষ্ট হয়েই তিনি ১৯৯৬ সালের জুন মাসে দলকে ২১ বছর পর রাষ্ট্রক্ষমতায় নিয়ে আসেন। তার আগে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের সময় রাষ্ট্রপতি পদে ছিলেন আবদুর রহমান বিশ্বাস। তিনি বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রপতির পদকে কতটা সম্মান দেখিয়েছেন, সেটা আমরা দেখতে পাই আবদুর রহমান বিশ্বাসের প্রতি তার মনোভাবে। কে এই পদে আছেন সেটা নয় বরং তিনি দেখেছেন পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশ-বিদেশের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী অবহিত করে থাকেন। আমরা দেখেছি, শেখ হাসিনা যতবার দেশের বাইরে গেছেন তার আগে-পরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সফর বিষয়ে অবহিত করেছেন ও পরামর্শ নিয়েছেন। সরকারের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অবহিত করতেও তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেছেন। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি তার এ সম্মান প্রদর্শন ছিল পরিপূর্ণ আন্তরিক এবং পরের দুই টার্ম এ দায়িত্ব পালনের সময়েও তার এ মনোভাব বজায় রয়েছে। অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রীকে আমরা রাষ্ট্রপতির পদের প্রতি এভাবে সম্মান জানাতে দেখি না।

শুধু রাষ্ট্রপতির প্রতি নয়, সাংবিধানিক প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর এ মনোভাব আমরা দেখি। তিনি প্রথম যখন ক্ষমতায় আসেন তখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। তিনি পূর্ণ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ অন্যান্য পদেও যারা বিএনপির মনোনয়নে দায়িত্বে ছিলেন, তাদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত এবং নিজেও তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। নির্বাচিত হয়েছিলেন ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি। দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি এবং শিক্ষার অগ্রগতিতে ছাত্রসমাজের বলিষ্ঠ ভূমিকার সপক্ষে তিনি সর্বদা অবস্থান নিয়েছেন। নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের হাতে যাতে সংগঠনের নেতৃত্ব থাকে সেজন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন ও আছেন। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নয়– এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়সংকল্প এবং এজন্য তার প্রত্যাশা– ছাত্র সংগঠনগুলোতে যেন মেধাবী, উদ্যমী ও সৃজনশীলরা ভিড় জমায়। যে দলের পেছনে ছাত্রসমাজ, তার হাতেই পেশিশক্তি এবং এ বলে বলীয়ান হলে রাষ্ট্রক্ষমতা সহজেই হাতে আসে– এমন অভিমত তার পছন্দ নয়। ছাত্রদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহারে তার আগ্রহ নেই। ১৯৯২ সালে ছাত্রলীগ অভ্যন্তরীণ কলহে জড়িয়ে পড়লে তিনি কয়েক মাসের জন্য সংগঠনের সব ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেন। তখন তার দল ক্ষমতার বাইরে। এ কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তিনি একবারও চিন্তা করেননি, রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব বিস্তারে ছাত্র সংগঠনের সক্রিয়তার বিকল্প নেই।

শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার অর্থ হচ্ছে কৃষিতে সাফল্য– এমনটি আজ সর্বমহলে স্বীকৃত। তার আমলেই যুগ যুগের খাদ্য ঘাটতির দেশ বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এজন্য নীতিগত ধারাবাহিকতা ও পরিকল্পিত উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল এবং সম্ভাব্য সবকিছুই তিনি করেছেন। কৃষকদের প্রতি তার রয়েছে অপরিসীম মমত্ববোধ। উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজনে তাদের ভর্তুকি দিতে হবে– এ প্রশ্নে তিনি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে অভাবনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। কৃষকদের উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা দেব– এ নীতিগত প্রশ্নে তিনি আপসহীন। সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিও রয়েছে তার গভীর মনোযোগ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদর্শিত পথ ধরে বাংলাদেশকে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি সচেষ্ট রয়েছেন। শিক্ষার প্রসার ও মান বাড়াতেও যত্নবান। বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এখন প্রায় পাঁচ কোটি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। উন্নয়নের সিঁড়িতে চলতে হলে দক্ষ মানবসম্পদ চাই– এটা তিনি যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেন।

তার গণতান্ত্রিক মনোভাবের আরেকটি পরিচয় আমরা পাই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িতদের বিচারের ক্ষেত্রে। অনেকেই এজন্য সামারি ট্রায়াল ধরনের পদক্ষেপের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তিনি চেয়েছেন বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ অবশ্যই যেন ল অব দি ল্যান্ড নীতিতে যথাযথভাবে অনুসৃত হয়। গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সমাজ গড়ে তুলতে হলে এটাই যে একমাত্র পথ, সেটা তিনি অনুধাবন করেন বলেই এভাবে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কবর রাজধানী ঢাকাতে নিয়ে আসার প্রস্তাবের ব্যাপারে তার অনাগ্রহের পেছনেও একই মনোভাব কাজ করছে। আমি নিজেও মনে করেছি যে বঙ্গবন্ধুর মরদেহ ঢাকায় স্থানান্তরিত হোক– অনেক অনেক মানুষের এমন ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। কিন্তু শেখ হাসিনা এর জবাব দেওয়ার জন্য জাতীয় সংসদের ফোরামকেই বেছে নিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কুচক্রী মহল অনেক টানাহেঁচড়া করেছে। তাকে মানুষের মন থেকে চিরতরে মুছে দেওয়ার অপচেষ্টাও কম হয়নি। তিনি তার জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় শান্তিতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তার আত্মা এভাবেই শান্তি পাবে।

আমি ওপরের যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছি, তা থেকে বলতে পারি–এখানেই তিনি অন্য সব রাজনৈতিক নেতার চেয়ে ভিন্ন, বৈশিষ্ট্যে অনন্য। তিনি দেশের কল্যাণে নিবেদিত, জনকল্যাণে দৃঢ়সংকল্প। বিশ্বসমাজের কাছেও তিনি সমাদৃত। বাংলাদেশ যে কথিত 'বাস্কেট কেস'-এর বদনাম ঘুচাতে পেরেছে এবং একটি সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে তার পেছনে শেখ হাসিনার বিপুল অবদান অনস্বীকার্য। এশিয়ার তিন প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি চীন, ভারত ও জাপান এবং বিশ্বের একক পরাশক্তি হিসেবে স্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তারা সবাই শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করছে। রাশিয়া, জার্মানি, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে গভীরভাবে আগ্রহী। গত সাড়ে চার দশকে বাংলাদেশের প্রতি এমন অনুকূল ও ইতিবাচক মনোভাব আর কখনোই দেখা যায়নি।

এটা ঠিক, বাংলাদেশের রাজনীতিতে খানিকটা অস্বস্তি রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষণীয়। কিন্তু এ অর্জন আরও ভালো হতে পারত, যদি রাজনীতি সুস্থ হতো। আমাদের প্রত্যাশার রাজনৈতিক অঙ্গন না থাকার পেছনে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দায় অবশ্যই রয়েছে এবং সমৃদ্ধ ও উন্নত স্বদেশ চাইলে এ ভ্রান্ত পথ তাদের চিরতরে পরিত্যাগ করতে হবে। তবে দেশে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী সব শক্তির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করতে হলে যারা যখন ক্ষমতায় থাকেন তাদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব থাকে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতেও চাই সরকারের প্রধান ভূমিকা। এজন্য অপরিহার্য একটি শর্ত– আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অব্যাহত উন্নতি ঘটানো এবং এর অবনতির যে কোনো অপচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করা। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিত একটি সংগঠন এবং অন্য কয়েকটি গবেষণা সংস্থা ২০১৫ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী পাঁচটি দেশের তালিকায় রেখেছে বাংলাদেশকে। অন্য চারটি দেশ হচ্ছে চীন, নাইজেরিয়া, ইরাক ও কাতার। তারা এটাও বলেছে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হবে ৭ শতাংশের ওপরে। এর চেয়ে বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে কেবল ভারত ও চীনে। এটাও বলা হচ্ছে, ২৫ বছর পর অর্থাৎ ২০৪০ সালে পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি বা পিপিপির হিসাবে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ৩৪তম থেকে উন্নীত হয়ে দাঁড়াবে ২৩তম। এ সময়ে আমরা অতিক্রম করে যাব মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়ার মতো সচ্ছল দেশকে। এ সব সূচক ও তথ্য থেকে বলা যায়, যদি রাজনৈতিক অস্বস্তি না থাকত এবং যদি বিনিয়োগে ব্যক্তি খাতে কাঙ্ক্ষিত গতি লাভ করত তাহলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক রূপান্তর আরও চমৎকার হতো। আমাদের জনসংখ্যাগত বিন্যাস উৎসাহব্যঞ্জক। ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীতে রয়েছে প্রায় ১০ কোটি নারী-পুরুষ। এ শক্তি থেকে কার্যকর সুফল পেতে হলে উচ্চশিক্ষায় যেমন প্রযুক্তির প্রয়োগ আরও বাড়াতে হবে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় আরও বেশি করে যুক্ত করতে হবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা। আমাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। উচ্চতর শিক্ষার তাগিদে গ্রাম থেকে শহরে বিপুল মানুষের স্থানান্তর ঘটছে। রাজধানীসহ বড় বড় শহরে এ কারণে অনেক বেশি তরুণের ভিড়। অনেক জেলা শহরেও এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কার্যকর সুশাসন থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা এটাও দেখছি, কোনো কোনো পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য, যা কখনও কখনও সংঘাতে রূপ নেয়। এসব বিষয় দেশের নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্ট সব মহলের নিবিড় পর্যবেক্ষণে না থাকলে আকস্মিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। সরকারের দূরদর্শিতা ও আওয়ামী লীগপ্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ সফলতার পথে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গত কারণেই প্রত্যাশা থাকবে শিক্ষাসহ অন্য পেশাজীবীদের অঙ্গনে যেন সৃজনশীল ও গঠনমূলক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। প্রধানমন্ত্রী এটা অবশ্যই পারবেন এবং এ বিশ্বাস কেবল আমার নয়, দেশ ও দশের কল্যাণকামী গণতান্ত্রিক মনোভাবে আস্থাশীল প্রতিটি মানুষের।

সরকারের দূরদর্শিতা ও আওয়ামী লীগপ্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ সফলতার পথে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গত কারণেই প্রত্যাশা থাকবে শিক্ষাসহ অন্য পেশাজীবীদের অঙ্গনে যেন সৃজনশীল ও গঠনমূলক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। প্রধানমন্ত্রী এটা অবশ্যই পারবেন এবং এ বিশ্বাস কেবল আমার নয়, দেশ ও দশের কল্যাণকামী গণতান্ত্রিক মনোভাবে আস্থাশীল প্রতিটি মানুষের